প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং

সত্যজিৎ রায়

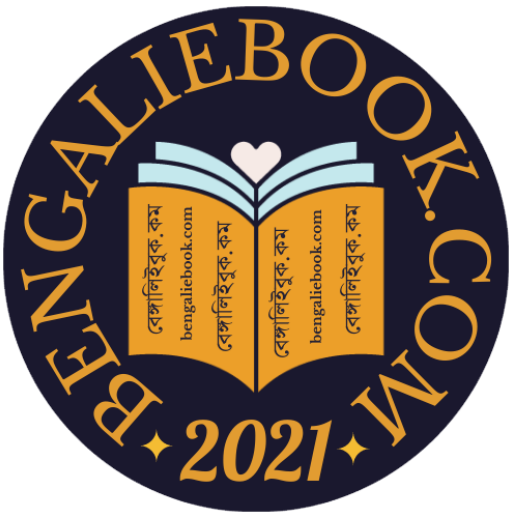

১৮ই অক্টোবর

আজ সকালে সবে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে ল্যাবরেটরিতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল, বৈঠকখানায় একটি বাবু দেখা করতে এয়েছেন।

আমি বললাম, নাম জিজ্ঞেস করেছিস?

প্রহাদ বলল, আর্জেন্তু না। ইংরিজি বললেন। দেখে নেপালি বলে মনে হয়।

গিয়ে দেখি খয়েরি রঙের ঝোলা কোটি পরা এক ভদ্রলোক-সম্ভবত চিন দেশীয়। আর তাই যদি হয় তবে চিনা ভিজিটর আমার বাড়িতে এই প্রথম।

আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক তাঁর সরু বাঁশের ছড়িটা পাশে রেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর অবধি বুকে আমায় অভিবাদন জানালেন। আমি নমস্কার করে তাঁকে বসতে বললাম এবং তাঁর আসার কারণটা জিজ্ঞেস করলাম।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে একেবারে ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে হেসে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হে হে হে হে-ইউ ফলগেত, ইউ ফলগেত। ব্যাদ মেমলি, ব্যাদ মেমলি।

ব্যাড মেমরি? ফরগেট? তবে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল? আমি কি ভুলে গেছি? আমার স্মরণশক্তি তো এত ক্ষীণ নয়।

আমার অপ্রস্তুত ভাবটা বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করে চিনা ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর ঝোলা কোটের পকেট থেকে একটা লাল রঙের কাঠের বল বার করে সেটাকে ডান হাতের দুটো আঙুলের ফাঁকে রেখে আমার নাকের সামনে তিন চার পাক ঘোরাতেই সেটা সাদা হয়ে গেল। তারপর আবার একপাক ঘোরাতেই কালো—আর আমারও তৎক্ষণাৎ চার বছর আগের এক সন্ধ্যার ঘটনা পরিষ্কার ভাবে মনে পড়ে গেল।

এ যে সেই হংকং শহরের জাদুকর চী-চিং!

চিনতে না-পারার কারণ অবিশ্যি ছিল। প্রথমত চিনেদের পরস্পরের চেহারার প্রভেদ সামান্যই। তার উপর পরিবেশ আলাদা। –কোথায় হংকং, আর কোথায় গিরিডি! আর ভদ্রলোকের আজকের পোশাকের সঙ্গে সেদিনের কোনও মিল নেই। সেদিন স্টেজে চী-চিং পরেছিলেন একটা সবুজ, লাল আর কালো নকশা করা ঝলমলে সিল্কের আলখাল্লা। আর তাঁর মাথায় ছিল ডোরাকাটা চোঙা-টুপি।

যাই হোক এই এক কাঠের বলের খেলা দেখে আমার মনে সেদিনের সমস্ত ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমি তখন যাচ্ছিলাম। জাপানের কোবে শহরে পদার্থবিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলনে যোগ দিতে। পথে হংকং-এ দুদিন থেকেছিলাম। আমারই এক আমেরিকান বন্ধু প্রোফেসর বেঞ্জামিন হজকিনস-এর বাড়িতে।

হজকিনস বৈজ্ঞানিক এবং ষাটের উপর বয়স হলেও ভারী আমুদে লোক। যেদিন পৌঁছোলাম, সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমায় ধরে নিয়ে গেলেন চী-চিং-এর ম্যাজিক দেখাতে।

ম্যাজিক আমার ভাল লাগে তার একটা কারণ হচ্ছে, ম্যাজিকের কারসাজি ধরে ফেলার মধ্যে আমি একটা ছেলেমানুষি আনন্দ পাই। তা ছাড়া কোনও নতুন ধরনের ম্যাজিক দেখলে জাদুকরের বুদ্ধির তারিফ করতেও ভাল লাগে। উঁচুদরের জাদুকর মাত্রেরই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব––এ সবই তাদের ঘাঁটতে হয়।

চী-চিং এর নাকি বেশ নামডাক আছে, তাই তিনি কী ধরনের জাদু দেখান সেটা জানার একটা আগ্রহ ছিল। হজকিনস-এর অনুরোধ তাই এড়াতে পারলাম না।

হাতসাফাইয়ের কাজ, আলোছায়ার কারসাজি, যান্ত্রিক ম্যাজিক, রাসায়নিক ভেলকি এসবই চী-চিং ভালই দেখালেন। কিন্তু তারপর যখন হিপনেটিজম বা সম্মোহনের জাদু দেখাতে আরম্ভ করলেন, তখনই ব্যাপারটা কেমন যেন আপত্তিকর বলে মনে হতে লাগল। সবচেয়ে খারাপ লাগল। যখন কতকগুলি নিরীহ গোবেচারা দর্শক বাছাই করে তাদের স্টেজের উপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চী-চিং নানান ভাবে তাদের অপদস্থ করতে শুরু করলেন। একটি লোক তো প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আপেল মনে করে উলের বল চিবোলেন। আর একজন তাঁর পোষা কুকুর মনে করে বেশ করে একটা চেয়ারের হাতলে হাত বুলোতে লাগলেন। মোহ কাটবার পর দর্শকদের অট্টরোলে এইসব লোকেদের মুখের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়েছিল।

আমি হজকিনসকে বললাম, আমার ভাল লাগছে না। লোকগুলো কি এইভাবে অপদস্থ হবার জন্য পয়সা দিয়ে ম্যাজিক দেখতে এসেছে?

হজকিনস বললেন, কী উপায় বলো? এদের ডাক দিলে এরা যদি স্টেজে যেতে আপত্তি না করে, তা হলে জাদুকরের উপর দোষারোপ করা যায় কী করে?

আমি সবে একটা উপায়ের কথা ভাবছি, এমন সময় খেয়াল হল দর্শকরা সবাই যেন আমারই দিকে ঘুরে দেখছে। ব্যাপার কী?

স্টেজে চোখ পড়তে দেখি চী-চিং হাসি মুখে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন। চোখচুখি হতে চী-চিং বললেন, আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, একবার স্টেজে আসবেন কি!

বুঝলাম আমার চেহারা দেখে চী-চিং আমাকেও একজন নিরীহ গোবেচারা বলেই ধরে নিয়েছে। চী-চিংকে শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ আপনা থেকেই এসে গেল দেখে আমি খুশি হয়েই স্টেজে উঠে গেলাম।

চী-চিং প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে আমাকে হিপনোটাইজ করার নানারকম চেষ্টা করলেন। চোখের সামনে আলোর লকেট দোলানো, চোখের পাতার উপর আঙুল বুলোনো, স্টেজে অন্ধকার করে কেবল নিজের চোখের উপর আলো ফেলে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাওয়া, ফিসফিস করে গানের সুরে একঘেয়ে ও আবোলতাবোল বকে যাওয়া...এর কোনওটাই চী-চিং বাদ দিলেন না। কিন্তু এত করেও তিনি আমার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না। আমি যেই সজাগ সেই সজাগই রয়ে গেলাম।

অবশেষে বেগতিক দেখে ঘর্মাক্ত অবস্থায় স্টেজের সামনে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ করে চাপা বিদ্যুপের সুরে চী-চিং বললেন, ভুলটা আমারই। যাকে হিপূনোটাইজ করা হবে, তার মস্তিষ্ক বলে বস্তু থাকা চাই! এ ভদ্রলোকের যে সেটি একেবারেই নেই, তা আমার জানা ছিল না।

দর্শকদের কাছে সেদিনকার মতো হয়তো চী-চিং-এর মান রক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর নিজের মনের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা জানতে পারিনি, যদিও সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

পরের দিন, হংকং ছেড়ে জাপানে চলে যাই।

ফিরতি পথে যখন আবার হংকং-এ নামি, তখন শুনি চী-চিং ম্যাজিক দেখাতে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়া।

তারপর এই চার বছর পরে আমার এই গিরিডির ঘরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ!

কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্যটা কী?

আমি প্রশ্ন করবার আগে চী-চিংই কথা বললেন।

ইউ প্রোফেসল সোঁকু?

উত্তরে জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

ইউ সায়ন্তিস্ত?

তাই তো মনে হয়।

সায়ান্স ইজ ম্যাজিক।

তা একরকম ম্যাজিকই বটে।

অ্যান্ড ম্যাজিক ইজ সায়ান্স! এঁ? হে হে হে।

চী-চিং বার বার হাসছেন। আমি ক্রমাগত গম্ভীর থাকলে অভদ্রতা হয়, তাই এবার আমি তাঁর হাসিতে যোগ দিলাম।

ইউ ওয়ালক হিয়াল? অর্থাৎ, এটা কি তোমার কাজের জায়গা?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তারপর চী-চিংকে নিয়ে গেলাম। আমার ল্যাবরেটরি দেখাতে।

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, আমার তৈরি ওষুধপত্র, আমার কাজের সরঞ্জাম, চার্ট ইত্যাদি দেখতে দেখতে চী-চিং বারবার বলতে লাগলেন, ওয়াঙ্গাফুল! ওয়াঙ্গাফুল।

পাশাপাশি তিনটে বড় বড় বোতলে তরল পদার্থ দেখে চী-চিং বললেন, ওয়াতাল? আমি হেসে বললাম, না জল নয়। এগুলো সব মারাত্মক অ্যাসিড।

অ্যাসিদ? ভেলি নাইস, ভেলি নাইস।

অ্যাসিড কেন নাইস হবে সেটা আমার বোধগম্য হল না!

দেখা শেষ হলে একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে একটা বেগুনি রুমাল বার করে ঘাম মুছে চী-চিং বললেন, ইউ আল্ গ্লেত্।

চী-চিং-এর কথার প্রতিবাদ করে আর অযথা বিনয় প্রকাশ করলাম না, কারণ আমি যে গ্রেট সেটা অনেক দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর অনেক আগেই স্বীকার করেছেন।

ইয়েস। ইউ আলগ্লেত্ব। বাত আই অ্যাম গ্লেতালা!

লোকটা বলে কী? কোথাকার কোন এক পেশাদার ম্যাজিশিয়ান, অর্ধেক সময় লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা নিচ্ছে...আর সে বলে কিনা আমার চেয়ে গ্রেটার। কী এমন মহৎ কীর্তি তার রয়েছে যেটা পৃথিবীর আর পাঁচটা পেশাদার জাদুকরের নেই?

প্রশ্নটা মনে এলেও মুখে প্রকাশ করলাম না।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ আগেই কফি দিয়ে গিয়েছিল। চী-চিং দেখি কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন।

আমিও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে উপর দিকে চাইতেই চী-চিং বলে উঠলেন, লিজাদ। লিজার্ড.অর্থাৎ সরীসৃপ!

যেটাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হল, সেটা হল আমার ল্যাবরেটরির বহুকালের বাসিন্দা টিকটিকি।

জানোয়ারটির বাংলা নাম চী-চিংকে বলতে তিনি আবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

তিকিতিকি! হা হা! ভেলি নাইস! তিকিতিকি।

দুই চুমুকে কফিটা শেষ করেই চী-চিং উঠে পড়লেন। তিনি নাকি কলকাতায় ম্যাজিক দেখবেন সেই রাত্রেই-সুতরাং তাঁর তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। গিরিডি এসেছেন নাকি একমাত্র আমার সঙ্গেই দেখা করতে।

চী-চিং চলে যাওয়ার পর অনেক ভেবেও তাঁর আসার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

১৯ শে অক্টোবর

আজ দুপুরে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় আমার বেড়াল নিউটন এসে তড়াক করে আমার কাজের টেবিলের উপর উঠে বসল। এ কাজটা নিউটন কখনও করে না। টেবিলের উপরটা আমার গবেষণার নানান যন্ত্রপাতি ওষুধপত্রে ডাই হয়ে থাকে। সে আমার বাড়িতে প্রথম আসার কয়েকদিনের মধ্যেই একবার টেবিলে ওঠাতে আমার কাছে ধমক খেয়েছিল। তারপর থেকে আর দ্বিতীয়বার ধমকের প্রয়োজন হয়নি। আজ তাকে এভাবে নিষেধ অগ্রাহ্য করতে দেখে আমি বেশ থাতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর সামলে নিয়ে কড়া করে কিছু বলতে গিয়ে দেখি সেও চেয়ে আছে। কড়িকাঠের দিকে।

উপরে চেয়ে দেখি কালকের মতো আজও টিকটিকিটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিউটন এ টিকটিকি ঢের দেখেছে এবং কোনওদিন কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। আজ সে পিঠ উচিয়ে লোম খাড়া করে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে চেয়ে দেখছে কেন?

নিউটনকে ধরে নামিয়ে দেব মনে করে তার পিঠে হাত দিতেই সে এমন ফ্যাশ করে উঠল। যে আমি রীতিমতো ভড়কে গেলাম।

টিকটিকির মধ্যে এমন কিছু কি সে দেখেছে যেটা মানুষের চোখে ধরা পড়ছে না?

দেরাজ খুলে বাইনোকুলারটা বার করে সেটা দিয়ে টিকটিকিটাকে দেখলাম।

সামান্য একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি? মনে হল পিঠের উপর লাল চাকা চাকা দাগটা যেন ছিল না। আর চোখের মধ্যে যে হলদের আভা-সেটাও কি আগে লক্ষ করেছি। কোনওদিন? বোধ হয় না। তবে এটা ঠিক এর আগে কোনওদিন বাইনোকুলার দিয়ে এত কাছ থেকে টিকটিকিটাকে দেখার প্রয়োজন হয়নি।

জানোয়ারটাকে নড়তে দেখে চোখ থেকে যন্ত্রটাকে সরিয়ে নিলাম।

টিকটিকিটা সিলিং বেয়ে দেয়ালে এসে নামল। তারপর দেয়াল বেয়ে নেমে এসে সুড়ুৎ করে আমার শিশিবোতলের আলমারিটার পিছনে ঢুকে গেল।

তাকে আর দেখতে না পেয়েই বোধ হয় নিউটনের উত্তেজনোটা চলে গেল। সে নিজেই টেবিল থেকে নেমে একটা গরুর গরুর আওয়াজ করতে করতে দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল। আমিও টিকটিকির চিন্তা মন থেকে দূর করে আমার গবেষণার কাজ নিয়ে পড়লাম।

আপাতত আমার কাজ হচ্ছে একটি পদার্থ আবিষ্কার করা যেটার ছোট্ট একটা বড়ি পকেটে রাখলেই মানুষ শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা অনুভব করবে। অর্থাৎ এয়ার-কন্ডিশনিং পিল।

আমার চাকর প্রহ্লাদ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমার কাজ করছে। সে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কখনও ঘাঁটাঘাঁটি করে না। বাইরের লোকজন কদাচিৎ। আমার বাড়িতে এলেও আমার ল্যাবরেটরিতে কখনই আসে না—এক বৈজ্ঞানিক না হলে, অথবা আমি নিজে না নিয়ে এলে।

আমি যখন ল্যাবরেটরিতে থাকি না, তখন দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। জানালাগুলোও ভিতর দিক থেকে ছিট্‌কিনি লাগানো থাকে।

কাল রাত্রেও দেখে গেছি যে আমার সেই ভীষণ তেজি অ্যাসিডের তিনটি বোতলই প্রায় কানায় কানায় ভর্তি।

আজ সকালে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি বাঁদিকের-অর্থাৎ কাবেডিয়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি।

রাতারাতি যে অ্যাসিড বাষ্প হয়ে উবে যাবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। বোতলের গায়ে ফুটোফাটাও নেই যে চুইয়ে টেবিলে পড়ে শুকিয়ে যাবে। অ্যাসিড। তবে গেল কোথায়? তিনটি অ্যাসিডের প্রত্যেকটিই এত তেজিয়ান যে সেগুলো নিয়ে কেউ অসতর্কভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়ে এই রহস্যের কোনও কুলকিনারা পেলাম না। অথচ অ্যাসিডের অভাবে আমার এক্সপেরিমেন্ট চালানো অসম্ভব।

এই অবস্থায় কী করা যায় সেটা ভাবছি। এমন সময় একটা মৃদু খচমচ শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার শিশিবোতলের আলমারির মাথায় উপর দিয়ে একটা প্রাণী উঁকি দিচ্ছে।

প্রাণীটি আমারই ল্যাবরেটরির সেই প্রায় পোষা টিকটিকি, কিন্তু এখন আর তাকে টিকটিকি বলা চলে না। কারণ তার চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের মণিতে এখন আর কালো অংশ বলে কিছুই নেই, সবটাই হলদে এবং সেটা মোটেই স্নিগ্ধ হলদে নয়। বরঞ্চ তাতে কেমন যেন একটা আগুনের ভাঁটার আভাস আছে।

নাকেও একটা প্রভেদ লক্ষ করলাম। ফুটোগুলো আগের চেয়ে অনেক বড়।

গায়ের রং আগে ছিল হালকা সবুজ ও হলদে মেশানো। এখন দেখছি সবাঙ্গ লাল চাকাচাকায় ভর্তি।

www.bengaliebook.com

আলমারির পিছনে টিকটিকির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি আমি না জানতাম, তা হলে মনে করতাম এ এক নতুন জাতের সরীসৃপ।

টিকটিকিটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টি আমারই দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। ফোঁস বলছি। এইজন্যে যে নিশ্বাসের শব্দটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

আর একটা কথা বলা হয়নি-টিকটিকিটা লম্বায় আগের চেয়ে কিছু বেশি বলে মনে হল।

আমি তাকিয়ে থাকতেই সেটা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের দিকে চাইল।

তারপর আলমারির মাথার কোণটাতে এগিয়ে কিছুক্ষণ ওত পাতার ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড লাফে একেবারে সোজা টেবিলের উপর এসে পড়ল। আমার কাচের যন্ত্রপাতি সব ঝনঝনি করে উঠল।

আলমারি থেকে টেবিলের দূরত্ব প্রায় দশ হাত; তাই আমার কাছে এই বিরাট লংজাম্প এতই অপ্রত্যাশিত যে আমি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে থ মেরে গেলাম।

টেবিলে এসে পড়াতে টিকটিকিটাকে এখন বেশ কাছ থেকেই দেখতে পেলাম। লেজটায়–এক লম্বায় বেড়ে যাওয়া ছাড়া, আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। পা মাথা চোখ নাক গায়ের রং সবই বদলে গেছে। মাথার উপরটায় দুটো চোখের মাঝখানে লক্ষ করলাম একটা ছোট্ট শিঙের মতো কী যেন গজিয়েছে। আর পায়ের নখগুলো যেন অস্বাভাবিক রকম বড় ও তীক্ষ্ণ।

টিকটিকিটা আমার অ্যাসিডের বোতলগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে।

তারপর দেখলাম মুখটা হাঁ করে সে একটি লকলকে জিভ বার করল। জিভের ডগাটা সাপের জিভের মতো বিভক্ত।

এর পরের দৃশ্য এতই অবিশ্বাস্য যে আমার হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায়ই রইল না।

টিকটিকিটা তরতার করে এগিয়ে গিয়ে কাবেডিয়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটার গা বেয়ে উঠে পিছনের পা দুটো দিয়ে বোতলের কানাটা আকড়ে ধরে সমস্ত শরীরটা বোতলের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ওই সাংঘাতিক অ্যাসিডের বাকিটুকু চকচক করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল।

খাওয়ার সময় লক্ষ করলাম বোতলের বাইরে দোলায়মান লেজটার চেহারা বদলে গিয়ে বাকি শরীরের সঙ্গে মানানসই হয়ে গেল এবং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—ড্রাগন।

চিনের ড্রাগন!

আমার ঘরের প্রায় পোষা টিকটিকি আজ ড্র্যাগনের রূপ ধারণ করেছে, আর এই ড্র্যাগনের প্রিয় পানীয় হল আমার এই মারাত্মক অ্যাসিড।

বৈজ্ঞানিক বলেই বোধ হয় চোখের সামনে এমন একটা আশ্চর্য...প্রায় অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখে, এর পরে আরও কী ঘটতে পারে সেটা জানার একটা প্রচণ্ড কৌতুহল অনুভব করেছিলাম। যা ঘটল তা এই...

টিকটিকিটা অ্যাসিড খেয়ে ড্র্যাগনের রূপ ধরে বোতলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আয়তনে প্রায় আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল। লক্ষ করলাম তার নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

টিকটিকিটা এবার চলল দ্বিতীয় বোতলের দিকে। এতে আছে নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন অ্যাসিড।

বোতলের পিঠটায় সামনের দু-পা দিয়ে ভর করে উঠে এক কামড়ে ছিপিটা খুলে ফেলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টিকটিকিটা আমার সমস্ত নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন শেষ করে ফেলল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সাইজ হয়ে দাঁড়াল প্রায় তিন হাত।

দ্বিতীয় বোতল শেষ করে তৃতীয়টির দিকে এগোনোর সময় আমার মন বলে উঠল– আর না। এবারে এটাকে সায়েস্তা করার উপায় বার করতে হবে। হলেই বা অ্যাসিডখোর; আমার মতো বৈজ্ঞানিকের হাতে কি একে ঘায়েল করার কোনও কল নেই?

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি ঘরের কোনায় রাখা লোহার সিন্দুকটা থেকে আমার ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ ইলেকট্রিক পিস্তলটি বার করলাম। তাগ করে মারলে একটি ৪০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক যে কোনও প্রাণীকে নিঃসন্দেহে ধরাশায়ী করবে। পিস্তলটি আবিষ্কার করার পর আজ পর্যন্ত এটার ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন হয়নি। আজ আমি এর শক্তি পরীক্ষা করব। এই ড্র্যাগনের উপর।

ড্রাগন তখন সবে আমার ফোরোসোটানিক অ্যাসিডের বোতলের ছিপিটি খুলেছে। আমি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটি উচিয়ে তার কাঁধের উপর তাগ করে ঘোড়া টিপতেই একটা বিদ্যুতের শিখা তিরের মতো গিয়ে লক্ষ্যস্থলে লাগল।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে এবং গভীর আতঙ্কে দেখলাম, যে শকে একটি আস্ত হাতি ভস্ম হয়ে যাবার কথা, সে শক এই সাড়ে তিন হাত (ড্রাগনটি আয়তনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে) প্রাণীর কোনওই অনিষ্ট করতে পারল না! সামান্য একটু শিউরে উঠে ড্রাগন বোতল ছেড়ে প্রায় দশ সেকেন্ড তার হলুদ জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে একদৃষ্টি আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি অনুভব করলাম আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

তারপর ড্রাগনের নাক দিয়ে পড়ল নিশ্বাস, আর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরোল রক্তবর্ণ ধোঁয়া। সেই তীব্র ঝাঁঝালো বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার দৃষ্টি ও চেতনা লোপ পেতে শুরু করল।

অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্ত অবধি আমি দেখতে পেলাম ড্রাগন তার পায়ের আঘাতে ও লেজের আছড়ানিতে আমার টেবিলের সমস্ত যন্ত্রপাতি লণ্ডভণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করছে।

***

প্রহ্লাদের গলার আওয়াজে জ্ঞান হল।

বাবু, বাবু!

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে আছি।

প্রহ্লাদ জিভ কেটে বলল, অ্যাই দ্যাখ—আপনি ঘুমিয়ে পড়লে, আমি বুইতে পাইনি।

কী হয়েছে?

সেই নেপালি বাবু। তেনার লাঠিটা ফ্যালে গেলেন যে!

লাঠি?

দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখি হাসি মুখে চী-চিং দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর হাতে সেই সরু বাঁশের লাঠি।

দিস তাইম, আই ফলগেত মাই স্তিক। হে হে! ভেলি সলি!

আমার মুখ দিয়ে কেবল বেরোল—বাট দি ড্রাগন?

দাগন? ইউ সি দাগন?

আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি... বলতেও লজ্জা করল—কারণ আমার টেবিলের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু অ্যাসিড?...

তিনটি বোতলই যে খালি।

www.bengaliebook.com

আমি বিস্ফারিত নেত্রে খালি বোতলগুলোর দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় শুনলাম চী-চিং-এর খিলখিল হাসি।

হিহিহি! এ লিত্‌ল ম্যাজিক—বাত গ্রেত ম্যাজিক!...ওই তোমার ড্রাগন।

চী-চিং কড়িকাঠের দিকে আঙুল দেখালেন। উপরে চেয়ে দেখি আমার চিরপরিচিত টিকটিকি তার জায়গাতেই রয়েছে।

অ্যান্দ ইয়োল অ্যাসিদ!

এবার টেবিলের দিকে চাইতেই চোখের নিমেষে তিনটি খালি বোতল স্বচ্ছ তরল পদার্থে কানা অবধি ভরে উঠল!

চী-চিং এবার বাঙালি কায়দায় দুটো হাতের তেলো একত্র করলেন।

নোমোস্কাল, প্রোফেসাল সোঁকু।

চী-চিং চলে গেলেন।

প্রহ্লাদ শুনলাম বলছে, ভাবলাম বেশ সরেস লাঠিখান—কাজে দেবে। ও মা-বাবু এই গেলেন। আর এই এলেন। পাঁচ মিনিটও হয়নি।

***

পুনশ্চ। ১৮ই অক্টোবর। ড্রাগনের ঘটনাটা ডায়রিতে লিখতে গিয়ে দেখি সেটা আগেই লেখা হয়ে গেছে—আমারই হাতের লেখায়। এটাও কি তা হলে চী-চিং-এর দুর্ধর্ষ ম্যাজিকের একটা নমুনা?

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭২